Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 131 –138
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

ছোটগল্পে নিম্নবর্গ : মহাশ্বেতা দেবী

গুরুদাস বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : gurudasbiswas1947@gmail.com

ড. সমরেশ মজুমদার
তত্ত্বাবধায়ক,
বাংলা বিভাগ
সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়

Keyword

Abstract
Even though the tribal and tribal people living in the society are not compatible with the polite society, these people are the blossoming flowers of Mahasweta Devi's pen. Mahasweta Devi is a painter of marginal public life. He carried the 'Honorless Section' of the society in his writings. He is a personality who has embellished his creation world with people from the Dalit and tribal sections of the society. Almost all parts of his works are full of slanders of backward people. He wrote a number of novels about mid-life sorrows and desires towards the early stages of his career as a writer, he opined – 'Then I learned to write'. His own words – 'I learned to write and write again'.

He had to endure many hardships and pains to create the world of literary creation. Besides, many sacrifices have to be made. Intermingled with them over the years to get to know the tribe of society. Not only from the outside, he has visited the Dalit-tribes of the society. Mahasweta Devi became to them 'Marangdai' (Grandmother) and Mother. In return, he gave his identity. This is almost impossible for any writer to do. Naveen told Kishore in an interview that while working among the tribals, he broke the middle-class stereotypes, did not follow the so-called social norms, and lived his life independently. Once his work on tribals and his literary creation became one, the two can no longer be separated from his life. Writer Amar Dey said in this regard – "I think, we have to enter Mahasweta's literature on this basis." We do not know, never wanted to know, a large population of tribal society in India. Instead of being indifferent to them, I mocked and mocked them. They are repeatedly persecuted, oppressed, displaced and separated from the land. Even after the independence from the British era, the trend continues equally. We have to sit in a stupor after reading that history in Mahasweta's story.''

Mahasweta Devi writes about the backward classes of people in the society. He writes about neglected, oppressed, neglected, deprived classes. There is no doubt about it. The tendency to

submerge the mind and eyes further down beyond the middle class of the society is as if it is the right of his blood forever.

This time we will enter into the discussion about how Mahasweta Devi has portrayed the lower class life in selected short stories written about the lower class people. A class of people are being exploited, abused, neglected, oppressed every moment. They are fighting all their lives just to survive. It is unimaginable how hard one has to struggle for a handful of rice and salt. In the story of Mahasweta Devi, the subject of 'rice hunger' has repeatedly appeared. No writer seems to have used the same subject so many times. This shows that in his rice-centered story, Anna-Bubhukshu people also made rice which is dedicated to the dead in the shrine. Where food is not acceptable according to Shastri's rules, but the hungry people did not obey that rule. Some notable short stories in this regard are – 'Bhat', 'Mother of the Evening Morning', 'Jatidhan' etc.

Discussion

সমাজে বসবাসকারী আদিবাসী, অন্তেবাসী মানুষেরা ভদ্র সমাজের সাথে বেমানান হলেও এই মানুষেরাই মহাশ্বেতা দেবীর লেখনী কুঞ্জের বিকশিত ফুল। মহাশ্বেতা দেবী প্রান্তিক জনজীবনের চিত্রকার। সমাজের 'Honourless Section' কে তাঁর লেখনীতে বহন করেছেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি সমাজের দলিত ও উপজাতি শ্রেণীর মানুষদের দিয়ে তাঁর সৃষ্টি জগতকে সুসজ্জিত করে গড়ে তুলেছেন। তাঁর রচনার প্রায় সমস্ত অংশ জুড়েই রয়েছে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কলোতানে পূর্ণ। তিনি লেখক জীবনের প্রথম পর্বের দিকে মধ্য জীবনের দুঃখ-কষ্ট কামনা-বাসনা নিয়ে কিছু সংখ্যক গল্প উপন্যাস রচনা করেছিলেন, সে বিষয়ে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন—

> "তখন আমি লিখতে শিখেছিলাম'। ওঁরই কথা— 'আমি লিখতে লিখতে আবার লিখতে শিখেছি।"[১]

সাহিত্য সৃষ্টির জগৎ তৈরি করতে তাকে বহু কষ্ট ও যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। এছাড়া অনেক ত্যাগও স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয়েছে। সমাজের উপজাতিকে জানার জন্য বছরের পর বছর তাদের সাথে মিশেছেন। কেবলমাত্র বহির্জগৎ থেকে না দেখে, তিনি সমাজের দলিত-উপজাতি এদের অন্দরমহলে গমন করেছেন। মহাশ্বেতা দেবী তাদের কাছে হয়ে উঠেছেন 'মারাংদাঈ' (বড়দিদি) এবং মা। এর বিনিময় তিনি নিজের পরিচয় মিলিয়ে দিয়েছেন। যে কোনো লেখকের পক্ষে এটা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। নবীন কিশোরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন উপজাতিদের মধ্যে কাজ করতে করতে তিনি মধ্যবিত্ত সুলভ ধারণা গুলি ভেঙে ফেলেছেন, তথাকথিত সামাজিক নিয়ম পদ্ধতি মানেন না, নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করেন। একসময় উপজাতিদের নিয়ে তাঁর কাজ ও সাহিত্য সৃষ্টি একাকার হয়ে গেছে, এ দুটিকে আর তার জীবন থেকে পৃথক করা যায় না। এ বিষয়ে সাহিত্যিক অমর দে বলেছেন—

> "আমার মনে হয়, এই সূত্র ধরেই আমাদের মহাশ্বেতার সাহিত্যে প্রবেশ করতে হবে। ভারতের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী উপজাতি সমাজকে আমরা জানিনা, কখনো জানতে চাইনি। বরং ওদের প্রতি উদাসীন থেকে বিদ্রুপ ও তাচ্ছিল্য করেছি। ওরা বারবার নির্যাতিত, নিপীড়িত, আশ্রয়চ্যুত আর ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ব্রিটিশ আমল থেকে স্বাধীনতার পরও সেই ধারা সমান ভাবে চলেছে। মহাশ্বেতার কাহিনীতে সেই ইতিহাস পড়ে আমাদের স্তব্ধ ভাবে বসে থাকতে হয়।"[২]

আমরা কথায় বলি, কোন দিনের সূচনাতেই বোঝা যায় দিনটি কেমন যাবে। ঠিক তেমনি মহাশ্বেতা দেবীর বাল্য ও কৌশোরের দিকে তাকালেই এর কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। তাঁর বোন সোমা মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে (কোরক, মহাশ্বেতা) জানা যায়। ছেলেবেলা থেকেই সমাজের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেশার এক প্রবণতা মহাশ্বেতার ছিল। পিতার বদলি চাকরির সুবাদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেলামেশার একটা সুযোগ তার ঘটেছিল এবং সেই সুযোগকে তিনি যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আদিবাসী জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস লিখেছিলেন তা শুধু গল্প নয় জীবনের প্রকৃত সত্য ঘটনা। যেমন- 'অপারেশন বসাই টুডু', 'গিরিবালা', 'দৌপদী', 'ভাত', 'আজিম', 'ক্ষুধা', 'স্তন্যদায়িনী', 'ময়নামতি', 'অথবা একটি অলৌকিক কাহিনী', 'রুদালী', 'নুন', 'বেহুলা', 'বিছন', 'বায়েন', প্রভৃতি গল্পের মত অনেক গল্প সরাসরি বাস্তব প্রেক্ষাপট

থেকে উঠে এসেছে। যেমন- অতি অল্প অর্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয়কারী দাসপ্রথাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে 'আজির', 'ময়নামতি', 'অথবা একটি অলৌকিক কাহিনী'। সতীদাহ প্রথাকে অবলম্বন করে ন্যূনতম মজুরির দাবি অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'অপারেশন বসাই টুডু । ভিন রাজ্যে নারী'গিরিবালা' । দেহ ব্যবসাকে অবলম্বনে রচিত হয়েছে' দৌ' পাচার অবলম্বনেলতী', ইত্যাদি গল্পই পাঠককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বর্তমান ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এক কথায় তিনি স্বয়ং চোখে যা দেখেছেন অন্তরে যা বিশ্বাস করেছেন তাই কলমের আঁচড়ে ব্যক্ত করেছেন।তাঁর কাছে কর্মজীবন ও সাহিত্য কোনও আলাদা বিষয় নয়। এই কারণে মহাদেব হাঁসদা যখন প্রশ্ন করেছিলেন—

> "আপনি মূলত সাহিত্যিক। এত কিছু করছেন তো সাহিত্য কখন করেন?"[৩]

তখন এর উত্তর তিনি বলতে পেরেছিলেন—

> "এই গুলোই তো সাহিত্য। এই গুলোকে বাদ দিয়ে কী সাহিত্য করবো? সমাজসেবা আর সাহিত্যসেবাতে ফারাক কিছু নেই।"[৪]

মহাশ্বেতা দেবী লেখেন সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষ বর্গদের নিয়ে। তিনি লেখেন অবহেলিত, নির্যাতিত, উপেক্ষিত, বঞ্চিত শ্রেণীকে নিয়ে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের জায়গা নেই। সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ্ডি পেরিয়ে আরো নিচের দিকে মন ও চোখকে নিমজ্জিত করার প্রবণতাটি যেন তার বংশ পরম্পরা চির রক্তের অধিকার।

এবারে আমরা মহাশ্বেতা দেবীর নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিয়ে লেখা নির্বাচিত ছোটগল্পে কিভাবে নিম্নবর্গীয় জীবন তুলে ধরেছেন সে বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশ করব। একশ্রেণীর মানুষ প্রতি মুহূর্তে শোষিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত হচ্ছে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই তারা সারা জীবন লড়াই করে চলেছে। দুমুঠো ভাতের জন্য, নুনের জন্য কি কঠিন সংগ্রাম করতে হয় তা কল্পনাতীত। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে 'ভাতের খিদে' বিষয়টি বারবার ঘুরে ফিরে দেখা দিয়েছে। এরূপ একই বিষয় আর কোন লেখক বোধ হয় এতবার ব্যবহার করেননি। এতে দেখা যায় তাঁর ভাত কেন্দ্রিক গল্পে অন্ন-বুভুক্ষু মানুষেরা অন্ন করায়ও করেছে যা ধর্মস্থানে মৃতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। যেখানে অন্ন শাস্ত্রীর বিধানে গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষ সেই বিধান মানেনি। এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কটি ছোট গল্প হল- 'ভাত', 'সাঁঝ সকালের মা,' 'জাতিধান' প্রভৃতি।

ছোটগল্পে নিম্নবর্গের রূপরেখা :

ভাত :

ভাত গল্পে এক ধনশালী সংসার আর এক চির নিরন্ন মানুষের অবশ্যম্ভাবী অবুঝ সংঘাতের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এক ধনশালী পরিবারের কর্তা ক্যান্সার আক্রান্ত। তিনি মৃত্যু পথযাত্রী একদিকে চিকিৎসা অপরদিকে তান্ত্রিকের হোম দুটোই চলছে এক তালে কর্তাকে বাঁচানোর তাগিদে। বড়ো বাড়ির বড়ো সংসার হওয়ার দরুন অনেক কাজ। উচ্ছব নাইয়া নামে সর্বস্বান্ত হওয়া এবং অনেকদিন ভাত না খাওয়া একটি মানুষকে সহায়তাকারী হিসেবে নিয়ে আসে এ বাড়ির পরিচারিকা বাসিনী। ধনশালী বাড়িতে বাদা থেকে আসে হরেক-রকম চাল। অনেকদিন না খাওয়া উচ্ছবের চোখে ও কানে ঘা দিতে থাকে সেই রকমারি চালের শ্রবণবিলাস নাম মালাগুলি, 'ঝিঙেশাল চালের ভাত নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে। রামশাল চালের ভাত মাছের সঙ্গে। বড়বাবু কনক পানি চাল ছাড়া খান না, মেজো আর ছোটর জন্য বারো মাস পদ্মজালি চাল রান্না হয়। বামুন-চাকর-ঝিদের জন্যে মোটা সাপটা চাল।'[৫]

কথা ছিল কাঠচেরাই করার পর উচ্ছব খেতে পাবে। কিন্তু যতক্ষণ যজ্ঞ চলবে ততক্ষণ বাড়ির কেউ কিছু খেতে পারবে না। এই বিধান দেন তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ। ওদিকে খিদের জ্বালা তুঙ্গে উঠতে থাকে উচ্ছবের। যজ্ঞ শেষ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তেই মৃত্যু পথযাত্রী কর্তা পরলোকগমন করে। তখন শাস্ত্রের বিধান জারি করে তান্ত্রিক বলেন অশৌচ বাড়িতে যা কিছু খাবার রান্না করা হয়েছে, সমস্ত ফেলে দিতে হবে। অশিক্ষিত উচ্ছব যখন বুঝতে পারে রান্না করা সব ভাত ফেলে দিতে হবে তখন তার ভেতরের ক্ষুধার্ত আত্মা আহত ও বাধার কামোটের মত সে হিংস্র হয়ে ওঠে। বিশাল পিতলের অন্নপাত্রটি নিয়ে সে ছুটে চলে সকলের হাতের বাইরে স্টেশনে—

> "বসে, ও খাবল খাবল ভাত খায়। তাতে হাত ঢুকিয়ে দিতে সে স্বর্গ সুখ পায় ভাতের স্পর্শে। চন্নুনির মা কখনো তাকে এমন সুখ দিতে পারেনি। খেতে খেতে তার যে কী হয়। মুখ ডুবিয়ে দিয়ে খায়। ভাত, শুধু ভাত। বাদার ভাত। বাদার ভাত খেলে তবে তো সে আসল বাদাটার খোঁজ নির্ঘাত পাবে উচ্ছব। আরো ভাত খেয়ে নি। চন্নুনিরে! তুইও খা, চুন্নুনির মা খাও, ছোট খোকা খা, আমার মধ্যে বসে তোরাও খা। এবার জল খাই, জল! তারপর আরো ভাত। ভোরের টেনে চেইপে বসে সোজা ক্যানিং যাচ্ছি। ভাত পেটে পড়েচে এখন ঝানচি যে ক্যানিং হয়ে দেশঘরে ঝেতে হবে। উচ্ছব হাড়িটি জাপটে, কানায় মাথা ছুঁইয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।"[৬]

সে- সেই রহস্য জড়ানো অন্নসত্র, অদেখা চালের বাদাটির সন্ধান করতে চেয়েছিল, তার আর করা হয়ে ওঠেনা। পেতলের অন্ন পাত্রটি চুরি করার অপরাধে সেই স্থানেই তাকে ধরে ফেলে—

> "মারতে মারতে উচ্ছবকে ওরা থানায় নিয়ে যায়। আসল বাদাটার খোঁজ করা হয় না আর উচ্ছবের। সে বাদাটা বড় বাড়িতে থেকে যায় অচল হয়ে।"[৭]

ধনশালী পরিবারের বড়ো মাথার মানুষেরা সামান্য ভাতের হাড়ি চুরি করার অপরাধে তাকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। অথচ তার ভাতের অভাব খিদের জ্বালা কোনোটিই সেখানে অপরাধ মুক্ত করতে জায়গা পায়নি। এখানে কোন পক্ষই অপরপক্ষকে ঠিকমতো বুঝতে পারেনা। খুব সাধারণ ভাবেই মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে ভাতের থিম একটি পুনরাবৃত্তি থিম হয়ে দাঁড়ায়। এমন দৈন বিষয় নিয়ে দ্রুপদী থিম বিশ্ব সাহিত্যে আর মনে হয় দ্বিতীয়টি নেই।

সাঁঝসকালের মা :

ভাত কেন্দ্রে আরও দুটি গল্প হলো 'সাঁঝসকালের মা' ও 'জাদুধান'। 'সাঁঝসকালের মা' গল্পে দশাসই ও নির্বোধ এক যুবক সাধন কান্দোরি ভীষণ অভাবের মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠা সাধনের পেটের খিদের আগুন যেন কখনো নেভেনা। মা , জটি তার ছেলের ভাত যোগান দেওয়ার জন্য ঠাকুরানির ভেক ধরে হযজটি ঠাকুরানি। ভক্তদের কাছ থেকে তার চাওয়া ছিল পয়সা নয়, করি নয়, শুধু এক পালি চাল। সারাদিন শেষে সন্ধ্যা বেলা ঠাকুরানি হয়ে যেত সাধনের মা অর্থাৎ এক ক্ষুধার্ত সন্তানের মা। জটি ঠাকুরানি সেজে যে চাল সে সঞ্চয় করত মা হয়ে সে চালের ভাত তার সন্তানকে রান্না করে খাওয়াত।জটি ঠাকুরানি খেত এক ছোট্ট বাচ্চার মতো। রান্না করা খাবারের বেশি অংশ খেত তার ক্ষুধার্ত সন্তান সাধন। জটি ঠাকুরানী অনেকদিন ধরে এভাবে খাওয়ার জন্য সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তারপর তড়িঘড়ি করে পাড়ার সবাই সাধন কান্দোরির মাকে হাসপাতালে ভর্তি করলে—

> "তিন দিনের দিন ডাক্তার জটির রোগ ধরতে পারল জটিল রোগ বড় ছোঁয়াচে। আজও ভারত ভূমিতে তার চিকিৎসা বেরোয়নি কোন। এ রোগের নাম অনাহার। না খেয়ে না খেয়ে খুদকুঁড়ো সাধনকে খাইয়ে জটি ঠাকুরানির নারী শুকিয়ে গিয়েছিল।"[৮]

হঠাৎ একদিন সাধন কান্দোরির মা জটি ঠাকুরানি মারা যায়। মায়ের শ্রাদ্ধের সমস্ত চাল দিয়েছিল সাধন। কিন্তু শ্রাদ্ধ শান্তি শেষে পুরোহিতের পাওনা চাল গুলি নিজের গামছায় বেঁধে চুবোশালা বলে গালাগালি দিয়ে সে সেখান থেকে পালিয়ে আসে। তারপর বন্ধু বলরাম যখন বলে—

> "আরে ও ছরাদের চাল রে, তোর খেতে নাই।"[৯]

তখন সাধন সে কথা কানে নেয় না। কারণ তার কাছে—

> "ভাতের গন্ধ বড়ো ভালো গন্ধ। ভাতের গন্ধে সাধন তার মাকে খুঁজে পায়। যতদিন ভাত রাধবে সাধন, তপ্ত ভাত খাবে, ততদিন ওঁর কাছে, সাঁঝ সকালের মা বাঁধা থাকবে।"[১০]

তাই বলা যায়, এই গল্পে মহাশ্বেতা দেবী ভাতের ক্ষুধার যে জ্বালা, তার করুণ চিত্র সাধন কান্দোরির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে মনে হয়েছে যেন নিরন্ন মানুষের কাছে একমাত্র শাস্ত্র ক্ষুধার নিরাসন, ধর্মশাস্ত্র নয়।

জাতুধান :

মহাশ্বেতা দেবীর আরেকটি ভাত বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গল্প হলো, 'জাদুধান'। এখানে উল্লেখ্য সাজুয়া তিওর এক বিশাল আকৃতি দেহ এবং অমানুসি ক্ষুধার্ত মানুষ। যা মহাশ্বেতা দেবীর বেশিরভাগ গল্পে ফুটে উঠেছে। আর এই বিশাল আকৃতি দেহ ও বিপুল ক্ষুদা নিয়ে এই সমস্ত মানুষেরা যেন সমস্ত রকম উপবাসী জনসমাজের প্রতীকি প্রতিনিধি। সাজুয়া

রাক্ষসের মত যেতো বলে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা তাঁর নাম দিয়েছিল জাদুধান অর্থাৎ রাক্ষস। সে নামটিকে পছন্দই করেছিল। এরপর সেই একদিন সে একদিন বন্যার জলে ভেসে চলে গেছে এবং মারা গেছে, একদিন জ্ঞাতিরা এই সংবাদ পেয়ে তার কুষপুত্তলী দাহ করে শ্রাদ্ধ করে। তাদের মহাজন রামসিঙ্গি জ্ঞাতি ভোজনের চাল দেয় কিন্তু ওইদিনই জীবিত সাজুয়া গভীর রাতে ফিরে আসে। গোষ্ঠীর মাথা মাতং প্রধান সে সময় বলে সব চাল ফিরিয়ে দিতে হবে এর কারণ চাল দেওয়া হয়েছিল শ্রাদ্ধের জন্য। তখনই সাজুয়া স্থির করে ফেলে সে চালের বস্তা নিয়ে অনেক দূরে চলে যাবে। কিছু করে ফেলে সে চালের বস্তা নিয়ে অনেক দূরে চলে যাবে। গোষ্ঠী প্রধান মাতং বলে ওঠে—

> "আমি কারেও কিছু বলবো না। কিন্তু কাজটা কেমন হলো বল? শুদ্ধি হলো না, দাহ হল, দেও- দেবতার বিষে পড়বি।"[১১]

এর উত্তরে জাতধান বলে—

> "পড়লে পড়ল। পেটে ভাত রলে বুড়ো; সকল দেবতার রিষ বেরথা যায়।"[১২]

এই ভাবেই চিরকালের উজ্জ্বল মানুষ রূপে জাতুধান সাজুয়া এক অনন্য চরিত্র হয়ে ওঠে। মহাশ্বেতা দেবীও এই ভাবেই বার বার বিভিন্ন গল্পের মধ্যে দিয়ে বলতে চেয়েছেন, প্রয়োজন মৃতের নয়, জীবিদের। মহাশ্বেতা দেবী এইভাবেই অত্যন্ত সহজে ধর্মশাস্ত্র বিধানের অসারতা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর লেখায়। সমাজের ধর্মীয় নানা কুসংস্কার রোধে তাঁর লেখা একাধিক উপন্যাসকে ও গল্পকে কাজে লাগানো যেতে পারে এবং বিভিন্ন প্রচার মূলক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যেতে পারে তা রচনা সমূহকে। কিন্তু একথা বলা যেতেই পারে এমন সদিচ্ছা শাসকগোষ্ঠীর আছে বলে ধরে নেয়া যায় না। 'জাতুধান' গল্পে আমরা দেখি ক্ষুধার জ্বালা নিরাসনে সাজুয়া তিওর এর কাছে সমাজের কোন সামাজিক রীতিনীতি বাধা দিতে পারেনি। সাজুয়া চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সমাজের পতিত জনের আঁতের কথা তুলে ধরেছেন।

স্তন্যদায়িনী :

মহাশ্বেতা দেবী এই গল্পে দেখিয়েছেন একজন সহজ সরল স্বহৃদয় রমণীকে। প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে পরিবার সমাজ ও সংসার তাকে কিভাবে নিঃস্ব করে ব্যবহার করেছে এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাকে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে, সেই করুণ চিত্রটিই আলোচ্য গল্পে ফুটে উঠেছে। এই গল্পে আমরা দেখি যশোদাকে তার স্বামী কাঙালি এবং সমাজ সংসার নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করেছে। যশোদা যতদিন শারীরিকভাবে সক্ষম ছিল ততদিন তার নিজের কুড়িজন সন্তান ও হালদার বাড়ির তিরিশজন সব মিলিয়ে পঞ্চাশ জন সন্তানের দুধ-মা হয়ে রোজগার করে সংসার চালিয়েছে। বাহবা হিসেবে সমাজ তাঁকে 'দেবী' বলে আখ্যায়িত করেছে। শুধু তাই নয় তাকে বেশ তোয়াজও করেছে। কিন্তু সমাজ সত্যি কি তাকে প্রকৃত সম্মানের আসনে বসিয়েছিল? যদি তাই হতো তাহলে তার অক্ষম অবস্থায় সমাজ তাকে দূরে ঠেলে দিত না। গল্পে দেখতে পাই, যশোদা যখন ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর পথে ধাবিত হয় তখন সমাজ, স্বামী, দুধ-সন্তানেরাও তাকে দূরে ঠেলে দেয়। শুধু তাই নয়, স্বামী কাঙালীও যশোদার পরিবর্তে গোলাপিকে জীবন সঙ্গী রূপে কাছে টেনে নেয়। মোটকথা যশোদাকে প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থের জন্য সুকৌশলে ব্যবহার করেছিল। সমাজ সংসারের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েও চির অবধারিত মৃত্যু যখন এলো তখন ভাগ্যহীনা যশোদার নিজের বলে কাউকে পেল না। এ বিষয়ে লেখকের ব্যঙ্গমিশ্রিত উক্তি—

> "যশোদা ঈশ্বর স্বরূপিনী... যশোদার মৃত্যু ঈশ্বরের মৃত্যু। এ সংসারে মানুষ ঈশ্বর সেজে বসলে তাকে সকলে ত্যাগ করে এবং তাকে সতত একলা মরতে হয়।"[১৩]

এমন ভীষণ বাস্তব পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করিয়ে যেন লেখক বলেছেন—

> "বিশ্ব সংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধবে একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ থাকে না।"[১৪]

পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবস্থান সকল সময়েই প্রান্তিক। পুরুষ নিজের প্রয়োজনে নারীকে যেমন তোয়াজ করে, ব্যবহার করে, তেমনি প্রয়োজন ফুরোলে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলতেও দ্বিধা করে না। তাই চিত্র তথাকথিত শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ, নিজ উভয় সমাজের ক্ষেত্রে একই রকম সে চিত্রই তিনি নিবিড় অনুভূতিতে এই গল্পে বিশ্লেষণ করেছেন।

রুদালী :

রুদালী গল্পে আমরা দেখি সমাজের কঠিন আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে বেঁচে থাকার লড়াই। শনিচরী জাতে গঞ্জু, টাহার গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামের অন্য সবার মতো শনিচরীর জীবনটাও কেটেছে অসহনীয় দারিদ্রে। কয়েক বছরে একের পর এক মারা যায় জা, শাশুড়ি, ভাসুর, স্বামী এবং তারপর মারা যায় একমাত্র ছেলে বুধুয়া, ছেলে হারা হওয়ার পরে ছেলের বউ পালিয়ে যায়। কিন্তু পেটের দায়ে, এত মৃত্যুর পরেও শুধুমাত্র নাতি হারোয়াকে বাঁচাতে ব্যস্ত থাকার কারণে শনিচরীর কাঁদা হয়ে ওঠেনি। এমনকি হাতের পাঁচ একমাত্র নাতি হারোয়া পালিয়ে চলে গেলেও সে কাঁদেনি। অবশেষে এই নারীকে ভাগ্যের পরিহাসে প্রচুর কাঁদতে হয়। যে কান্না ছিল স্বামী, শাশুড়ি, ভাসুর, জা, বুধুয়া হারানোর জন্য নয়, সে কান্নাই তাকে কাঁদতে হয়েছিল রুটি রুজির প্রয়োজনে। সে পরবর্তীকালে হয়ে রোনেবালি পেশাদার রুদালী অর্থাৎ পেশাদার ভাবে কাঁদিয়ে। সমাজে মালিক মহাজনদের কেউ বা কারা মারা গেলে কাদার লোকের অভাব ঘটত, সেই কারণেই রুদালিরা অর্থের বিনিময়ে এই কাজটি করে থাকত। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ্য লোকপ্রচলিত সংস্কার অনুসারে যদি মৃতের জন্য কেউ না কাঁদে তবে তার আত্মা স্বর্গে গিয়েও শান্তি পায় না। এমনকি শেষকৃত্যে যে মালিক বা মহাজন যত বেশি রুদালী এনে কাঁদাতে পারবে, সমাজে তার মান তত বাড়বে। সাধ্যের বাইরে খরচা হলেও সমাজের মালিক শ্রেণী তা তুলে নেয় ধোবি, দুসাদ, গঞ্জু, কোলদের মাথা ভেঙে।

এইরূপ হৃদয় বিদারিত প্রচলন ব্যবস্থার অন্য কারও সুবিধা হোক না হোক শনিচরীদের মতো হতদরিদ্র রুদালীদের লাভ হতো এবং বাঁচার রস পেতো তারা। কিন্তু প্রশ্ন হল এই অন্নহীন মানুষ গুলো রুদালী রূপে বাঁচে কেন? কেমন করে অর্থ সামাজিক সমাজ ব্যবস্থায় এরা বাঁচার লড়াই করে সেটা দেখতেই গল্পকার মহাশ্বেতা দেবী এই কাহিনীর উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন—

> "দুলন নিস্পৃহ কঠিন গলায় বলল, বুধুয়াকে মা! যে কান্না তুই বুধুঢয়ার জন্য কাঁদিসনি, তা কাঁদতে বলছি না তোকে। এ হলো রুজির কান্না দেখবি, যেমন করে গম কাটিস, মাটি বয়ে নিস, তেমনি করে কাঁদতেও পারছিস।"[১৫]

মহাশ্বেতা দেবীর এই গল্পটি কোনও কাল্পনিক গল্প নয়। তিনি সত্যি ঘটনা অনুসরণেই গল্পটি রচনা করেছেন। গল্পের উৎস বিষয়ে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন—

> "তখন আমি পালামৌতে। বছর বার-চোদ্দোর ছেলে মেয়েরা আসত আমার কাছে। যে মেয়েটি আমার কাছে কাজ করত সে ওদের জন্য খিচুড়ি রাঁধত। একদিন তারা এলো, সঙ্গে তাদের মেয়েরা। তারা আদিবাসী। সে বলল- মা, ওদের কাজ সেরে আসতে তিনটে হবে। তখন এদের খেতে দিবি। বললাম কেন? সে বলল কেউ একজন মারা গেছে। ওখানে ওরা কাঁদতে যাবে, না কাঁদলে আত্মা স্বর্গে যাবে না। এই ঘটনার সঙ্গে আর একটা ঘটনা মনে পড়ল। কলকাতায় কাশী মিত্তিরের ঘাট। শিশির ভাদুড়ী মারা গেছেন আমি আর বিজন গেলাম। সেদিন কোনও এক ধনী মাড়োয়ারী মারা গেছেন। দেখেছিলাম সেখানেও অনেক মহিলা কাঁদছেন। ওর জন্য আপন কেউ কাঁদার নেই। ভাড়া করে এনে কাঁদাতে হলো, এই দৃশ্যটা মনে ছিল। তারপর পালামৌ এর ঘটনা। শুরু হলো অন্বেষণ। তারপর? সে তো ইতিহাস।"[১৬]

এই গল্পের সূত্র ধরে বলা যায় যে সমাজের হয়ে সামাজিক সত্যতা রক্ষা করাই ছিল এই সমস্ত রুদালীদের আসল ধর্ম এবং সত্য। বিনিময়ে তাদের স্থান ছিল বরাবরই মহাজন শ্রেণীর পদতলে। সেখানে পেটের খিদের কাছে সবকিছু হার মেনে যায়।

তাই পরিশেষে বলা যায় যে প্রথাগত গল্প লেখার পরিবেশকে দূরে সরিয়ে সমাজের বঞ্চিত মানুষের হৃদয়বিদারক কথা মহাশ্বেতা দেবী তার ছোট গল্পে যেভাবে তুলে ধরেছেন। তা ভিন্নমাত্রা দান করেছে বাংলা সাহিত্য জগতের ছোট গল্পকে। যে বাস্তব চিত্র আমরা অন্য কোন গল্পকারের গল্পে এই রূপ বিস্তৃতভাবে পাই না। তাই সমাজের পতিত বঞ্চিত মানুষের ইতিহাস জানতে হলে মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্প অধ্যয়ন আবশ্যক।

তথ্যসূত্র :

১. সমকালের জিয়নকাঠি- মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি -জুন-২০১৫,যুগ্ম সংখ্যা, পৃ. ২০৬
২. সমকালের জিয়নকাঠি- পৃ. ২০৭
৩. সমকালের জিয়নকাঠি- পৃ. ২০৯
৪. সমকালের জিয়নকাঠি- পৃ. ২১০
৫. সমকালের জিয়নকাঠি- পৃ. ২১২
৬. 'ভাত', গ্রন্থ- মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৪৩১
৭. 'ভাত', গ্রন্থ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭
৮. 'ভাত', গ্রন্থ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭
৯. 'সাঁঝসকালের মা'- মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র, তৃতীয় খন্ড, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪২০, জানুয়ারি ২০১৪, প্রকাশক- দে সুধাংশুশেখর, দেজ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০৭৩ পৃ. ৫৭
১০. 'সাঁঝসকালের মা'- পৃ. ৭০
১১. 'সাঁঝসকালের মা'- পৃ. ৭০
১২. 'জাতুধান'- মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ ১৪১৯, এপ্রিল ২০১২, প্রকাশক দে সুধাংশুশেখর, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৪৯
১৩. 'জাতুধান'- মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪৫
১৪. 'স্তন্যদায়িনী' মহাশ্বেতা দেবী গল্প সমগ্র, তৃতীয় খন্ড, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪২০, জানুয়ারি ২০১৪, প্রকাশক দে সুধাংশুশেখর, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পৃ. ১৬৯
১৫. 'স্তন্যদায়িনী' মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ১৬৯
১৬. 'রুদালী' মহাশ্বেতা দেবী, গল্পসমগ্র, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩০৮

সহায়ক গ্রন্থ :

১. মল্লিক দীপঙ্কর: 'বাংলা উপন্যাসে জনজাতি সমাজ ও সংস্কৃতি', প্রথম প্রকাশ - অক্টোবর – ২০১৫, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা – ০৯
২. মন্ডল ডক্টর চিত্ত ও রায়মন্ডল ডক্টর প্রমথা (সম্পাদনা) 'বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত' প্রথম প্রকাশ ১লা ফেব্রুয়ারি – ২০০৩, কলকাতা বইমেলা, কলকাতা -০৯
৩. মিশ্র হরপ্রসাদ, 'সাহিত্যের নানা কথা' নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা -৭৩, প্রথম প্রকাশ -১৩৬৩
৪. সামন্ত সুবল (সম্পাদনা) 'গল্প ও গল্পকার বিশেষ সংখ্যা', এবং মুশায়েরা, কলকাতা -৯০, ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, প্রথম প্রকাশ -১৯৯৯
৫. সেন মজুমদার জহর 'নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন' প্রথম প্রকাশ জুলাই – ২০০৭, কলকাতা -০৯
৬. সেনগুপ্ত সরসিজ: বিরসা মুন্ডা,নায়ক নির্মাণ, মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার : বাস্তবতার সন্ধান, সম্পা সোহিনী ঘোষ, অক্ষর প্রকাশনী -২০০৫
৭. বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদনা): মহাশ্বেতা, 'নানা বর্ণে ও নানা রঙে' প্রথম প্রকাশ- ১৫.০৫.২০১৫, কলকাতা – ০৯
৮. বসু নন্দিতা: 'ভূমিকা মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র' খন্ড ১০, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ – ২০০৩, কলকাতা – ০৯
৯. বসু নিতাই: অগ্নিগর্ভ অরণ্যচারী মানুষের রূপকার মহাশ্বেতা দেবী, শিলাদিত্য,জুন – ১৯৮২

১০. বন্দোপাধ্যায় ভারতী : মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প, শিল্প আর বাস্তবতার মেলবন্ধন, কোরক, মহাশ্বেতা সংখ্যা, বইমেলা ১৯৯৩, পু.মু. কোরক, মহাশ্বেতা, বইমেলা – ২০০৩

১১. বন্দোপাধ্যায় শমীক, ভূমিকা : 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৩

১২. বসু শর্মিলা: 'মানুষ এবং মানুষ এবং মানুষ' গ্রন্থ সমালোচনা মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প (প্রমা) প্রমা, রজত সংখ্যা, ১৯৫৮

১৩. ভদ্র গৌতম ও চট্টোপাধ্যায় পার্থ (সম্পাদনা) 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' প্রথম প্রকাশ – ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা – ১৪

১৪. ভট্টাচার্য্য সুতপা: 'আমি আমার মতো লিখি', শিল্প-সাহিত্য, মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি– ২০০৯